তাক্বলীদ এবং মাযহাবঃ বাড়াবাড়ি ও অবহেলার বিপরীতে মধ্যমপন্থী অবস্থান

ইউসুফ আল কারাদাওয়ী

ভাষাতাত্ত্বিক সংজ্ঞাঃ[১]

আরব ভাষাবিদদের মতে, “তাক্বলীদ” শব্দটি এর মূল “ক্বালাদা” থেকে উৎসরিত হয়েছে। “ক্বালাদা” অর্থ হচ্ছে এমন একটি হার যা শক্তভাবে গলায় বেঁধে দেয়া হয়। আর এখান থেকেই এসেছে কোন পথের “তাক্বলীদ” করার ধারণা। ব্যাপারটি অনেকটা এরকম যেন কোন একজন অনুসারী নির্দিষ্ট একজন মুজতাহিদের কোন রায় বা সিদ্ধান্তকে হারের মতই গলায় শক্তভাবে বেঁধে রাখে।

শরঈ সংজ্ঞাঃ

তাক্বলীদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইমাম শাওক্বানী তাঁর “সাইল আল জাররার” গ্রন্থে বলেছেন তাক্বলীদ হল প্রমাণ ছাড়া অন্য একজনের কথা অনুযায়ী আমল করা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাসূলের (সাঃ) হাদীসের উপর আমল করা, ইজমার উপর আমল করা, একজন মুফতীর মতানুযায়ী একজন সাধারণ মানুষের আমল করা, একজন বিচারক কর্তৃক নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য বিবেচনায় নেয়া তাক্বলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, এগুলোর প্রামাণ্যতা ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীস এবং ইজমাকে যারা স্বীকার করে নেয় তাদের জন্য উভয়টিই স্পষ্টরূপে শরঈ বাধ্যবাধকতার উৎস। একজন সাধারণ মানুষের জন্য কোন মুফতীর রায় অনুযায়ী আমল করা ইজমা দ্বারা স্বীকৃত। আর একজন বিচারকের বিচার প্রক্রিয়ায় নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য গুরুত্বের সাথে নেওয়ার বিষয়টি কোরআন ও সুন্নাহতে সাক্ষী নেয়ার হুকুম এবং ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

হাদীস বর্ণনাকারীদের বর্ণনা অনুসরণ করাও তাক্বলীদের গন্ডি বহির্ভূত কেননা হাদীসের শুদ্ধতা ও বৈধতা যাচাইয়ের পদ্ধতি (তাখরীজ) ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত। এছাড়া এগুলো কেবল হাদীস বর্ণনাকারীদের উক্তি নয় বরঞ্চ এ বর্ণনাসমূহ মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সাথে সম্পর্কিত।

ইবনে আল হুমামের (মৃত্যু ৮৬১ হিজরী) “তাহরীর” গ্রন্থে তাক্বলিদের আরো ভালো সংজ্ঞা পাওয়া যায়ঃ “তাক্বলীদ হচ্ছে শরঈ বাধ্যবাধকতার উৎস হিসেবে স্বীকৃত নয় এমন কারো কথার উপর প্রমাণ ছাড়া আমল করা।” আল কাফফালের (মৃত্যু ৩৬৫ হিজরী) মতে, “এটি (তাক্বলীদ) হচ্ছে কারো বক্তব্য (ফিক্বহী রায়) গ্রহণ করে নেয়া এটা না জেনেই যে তিনি তা কোথা থেকে পেয়েছেন।” শাইখ আবু হামিদ আল আসফারাইনি (মৃত্যু ৪০৬ হিজরী) এবং উস্তায আবু মানসুর আবদুল ক্বাহির আল বাগদাদী (মৃত্যু ৪২৯ হিজরী) উভয়ের মতে, “এটি (তাক্বলীদ) হচ্ছে শরঈ বাধ্যবাধকতার উৎস হিসেবে স্বীকৃত নয় এমন কারো ফিক্বহী রায়কে প্রমাণ ছাড়া গ্রহণ করে নেয়া।”

কোন মাযহাবের তাক্বলীদ করার উপর হুকুমঃ

তাক্বলীদের ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়ঃ

১। যেকোন একটি মাযহাবের তাক্বলীদ বাধ্যতামূলক হওয়া

২। তাক্বলীদ নিষিদ্ধ এবং ইজতিহাদ বাধ্যতামূলক হওয়া

৩। যার ইজতিহাদ করার যোগ্যতা নেই তার জন্য তাক্বলীদ জায়েজ হওয়া

প্রথম মতঃ কোন একটি মাযহাবের তাক্বলীদ বাধ্যতামূলক হওয়া

প্রথম মত সাধারণ মানুষ-সুযোগ্য আলেম নির্বিশেষে সবার উপর তাক্বলীদ করাকে বাধতামূলক হিসেবে প্রতিপন্ন করে। এ মত অধুনা আলেমদের যেকোন ধরনের বা পর্যায়ের ইজতিহাদ করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এ মতানুসারে ইজতিহাদ তাত্ত্বিকভাবে নিষিদ্ধ এবং প্রায়োগিক দিক থেকে অকার্যকর যার দরজা হিজরী তৃতীয় বা চতুর্থ শতক বা এর পূর্বেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে ভাবা হয়।

এ মত অনুযায়ী চার মাযহাবের যেকোন একটির তাক্বলীদ করাকে প্রত্যেক মুসলিমের উপর ধর্মীয়ভাবে আবশ্যক গণ্য করা হয়। এ মতের অনুসারীগণ অধুনা আলেমদের তাদের নিজেদের অনুসৃত মাযহাবের বাইরে কোন মতকে প্রাধান্য দেয়ার অনুমতিও দেন না। চারটি জনপ্রিয় মাযহাবের বাইরে গিয়ে অন্য কোন মাযহাব বা মত (যদিও তা সাহাবা বা তাবেয়ীদের হয়) অনুসরণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এ মতের অনুসারীগণ যদি বিদ্যমান মতসমূহের একটিকে আরেকটির উপর প্রাধান্য দেয়ার অনুমতি না দিয়ে থাকেন তবে তো তারা স্বাধীন ইজতিহাদের আরো বেশী বিরোধিতা করে থাকেন যদিও সেটি কিছু বিষয়ের উপর আংশিক ইজতিহাদ হয়ে থাকে। মানুষ জীবনের পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন চিন্তাধারা ও আদর্শের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও তারা স্বাধীন ইজতিহাদকে প্রত্যাখ্যান করেন। আর এসবই তাদের এই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত যে, ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে দিতে হবে।

পরবর্তী সময়ের কিছু আলেম চার মাযহাবের যেকোন একটি অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলেছেন। ইমাম আদ দারদিরের ফিক্বহের উপর গ্রন্থ “আশ শারহ আস সাগীর” ও তাফসীর আল জালালাইন উভয়ের উপর হাশিয়ার রচয়িতা শাইখ আস সাওয়ী আল মালিকি (মৃত্যু ১২৬১ হিজরী) বলেনঃ “চার মাযহাবের বাইরে কোন মতের তাক্বলীদ করা জায়েজ নয় যদিও তা কোন সাহাবার কথা, সহীহ হাদীস ও কোরআনের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় কেননা, যে চার মাযহাবের বাইরে অবস্থান করে সে নিজে পথভ্রষ্ট এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করে। এটি কাউকে কুফরীর দিকেও নিয়ে যেতে পারে কারণ, কোরআন ও সুন্নাহতে যা ভাসাভাসাভাবে প্রতীয়মান হয় তা থেকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কুফরীর ভিত্তিতেই গ্রহণ করার নামান্তর।”

> আশ-শাওক্বানীর সমসাময়িক এই শাইখের কঠোরতার দিকে লক্ষ্য করুন! দুজনের মতের বৈপরীত্যের দিকেও খেয়াল করুন। তিনি চার মাযহাবের বাইরে কিছুর তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেন যদিও তা সাহাবার কোন কথার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এর চেয়েও নিকৃষ্ট ব্যাপার এই যে, সহীহ হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও সেটার তাক্বলীদ নিষিদ্ধ এমনকি কোরআনের সাথে হলেও। আরেকটি বাড়াবাড়ি হচ্ছে, চার মাযহাবের বাইরে অবস্থানকারী (এমনকি তা কেবলমাত্র কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে হলেও) কাউকে পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্টকারী মনে করা এবং সেটা কুফরের দিকে নিয়ে যেতে পারে এমনটা ভাবা। এসবই হঠকারিতা এবং তা ইজতিহাদী আলেমদের ঐক্যমতের বিরুদ্ধে যায়।

তাক্বলীদ করা আবশ্যক এ মতটি পরবর্তী শতাব্দীতে ধর্মীয় স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গৃহীত হয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সালাফ (প্রথম প্রজন্মের) আলেমরা এই রেওয়াজকে খালাফদের (পরবর্তী প্রজন্মের আলেমদের) কাছে পৌঁছে দেন যারা আবার তাদের ছাত্রদের মনে বদ্ধমূল করে দেন যেঃ “যে ব্যক্তি কোন আলেমের তাক্বলীদ করে, সে সালেম (নিরাপদ) অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হয়।”

আমার মনে আছে, আল আযহারের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উলুমুত তাওহীদ ক্লাসে আমি এটি শিখেছিলাম। আমাকে আল ক্বারনীর জাওহারাহ এবং আল বাজুরী কর্তৃক এর ব্যাখ্যা পড়তে হয়েছিল। সেখানে লেখক বলেন,

“মালিক এবং বাকি ইমামগণের যেমনটি আবুল কাসিমের মত উম্মাহর পথপ্রদর্শক বলেন, জ্ঞানীদেরও যেকোন একজনের তাক্বলীদ করা প্রয়োজন কেননা মানুষ যে শব্দ বুঝে তাতেই বর্ণনা করে”

আবুল কাসিম বলতে এ ছত্রে বিখ্যাত সূফী আল জুনাইদ ইবনে মুহাম্মাদকে (মৃত্যু ২৯৭ হিজরী) বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুক। এটি এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, ফিক্বহের চার মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে যেকোন একজনের তাক্বলীদ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর বাধ্যতামূলক।

এখানে ইমাম মালিককে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ লেখক একজন মালিকী। লেখকের মতে, তারবিয়্যাতের (আত্মশুদ্ধি) ক্ষেত্রে যেমনটি সূফী ইমামদের অনুসরণ করা হয়, ঠিক তেমনিভাবে ফিক্বহের ইমামদেরকেও অনুসরণ করতে হবে। আলেমদের প্রতি জুনাইদ এমনই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন - তরীক্বার (পদ্ধতি) নিষ্ঠা, তাঁর দিক-নির্দেশনার গভীরতা, চরমপন্থা ও বিদা□আত থেকে তাঁর সুদূর অবস্থান।

কিছু আলেম আবার আক্বীদার ব্যাপারেও আবুল হাসান আল আশ□আরী বা আবুল মানসুর আল মাতুরিদীর মত সুপরিচিত যেকোন ইমামের অনুসরণ করার কথা বলেন।

মাগরেবে (লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো, মৌরিতানিয়া) আমাদের ইলমী ভাই এবং যায়তুনা, কায়রাওয়ান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বহুল প্রচলিত প্রথা হচ্ছে আক্বীদায় আশ□আরী মাযহাব, ফিক্বহে মালিকী মাযহাব ও আদাবের ক্ষেত্রে জুনাইদের মাযহাব বা সূফী তরীক্বা অনুসরণ করা। আল্লাহ তাঁদের সবার উপর সন্তুষ্ট হন।

এ মতের খুঁটিনাটি ও সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

১। সবার উপর এমনকি আলেমদের উপরও তাক্বলীদ আবশ্যক হওয়া

২। কেবলমাত্র চার মাযহাবের ইমামদের তাক্বলীদ বাধ্যতামূলক হওয়া। চার মাযহাবের বাইরে অন্য কোন ফিক্বহী রায় গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হওয়া।

৩। এই চার ইমামের মধ্যে কেবলমাত্র যেকোন একজনের তাক্বলীদ বাধ্যতামূলক হওয়া। তাই এই চার মাযহাবের মধ্যে কোন একটি মাযহাবের কিছু মত সুস্পষ্টভাবে দুর্বল প্রতিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও চার মাজহাবেরই অন্য কোন একটি মাযহাব থেকে মত গ্রহণ করা জায়েজ না হওয়া।

৪। ইজতিহাদের দরজা বন্ধ রাখা এবং ইজতিহাদের দিকে আহবানের পথ রুখে দাঁড়ানো যদিও তা আংশিক ইজতিহাদ হয়।

৫। নিজের মাযহাবকে অন্য মাযহাব থেকে উত্তম মনে করা আর এভাবে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক মনমানসিকতার কাঠামোতে আটকে যাওয়া।

তাক্বলিদের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গীকে অনেক আলেম খন্ডন করেছেন যেমনঃ ইবনে আবদুল বার, ইবনে হাযম, ইবনে তাইমিয়া, ইবনিল ক্বায়্যিম, আস-সান□আনি, আশ-শাওক্বানী, আদ দেহলভী প্রমুখ।

দ্বিতীয় মতঃ তাক্বলীদ নিষিদ্ধ এবং ইজতিহাদ বাধ্যতামূলক

দ্বিতীয় মতটি প্রথম মতের ঠিক উল্টোঃ সকলের জন্য তাক্বলীদ নিষিদ্ধ এবং ইজতিহাদ করা বাধ্যতামূলক। এ মতের অনুসারীগণ প্রত্যেক মুসলিমের উপর সরাসরি কোরআন ও সুন্নাহ থেকে ফিক্বহী রায় গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক মনে করেন। তাঁরা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে চার মাযহাবের অনুসরণকে বাতিল গণ্য করেন এবং যারা চার মাযহাব অনুসরণ করার পক্ষে তাদেরকেও প্রচন্ডভাবে আক্রমণ করেন। সম্ভবত তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাক্বলীদের উপর আক্রমণ করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে থাকেন যেহেতু তাঁরা মাযহাবগুলোকেই আক্রমণ করে থাকেন। কেউ কেউ আবার আগ বাড়িয়ে মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতাদেরকেই আক্রমণ করে বসে থাকেন।

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, এ মতের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রস্তাবক হচ্ছেন বিখ্যাত যাহেরী ফক্বীহ আবু মুহাম্মাদ ইবনে হাযম। তিনি ফিক্বহের উসূলী মূলনীতির উপর □আল ইহকাম ফি উসূল আল-আহকাম□, তুলনামূলক ফিক্বহের উপর □আল মুহাল্লা□, বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মীয় ফেরকার ইতিহাসের উপর □আল ফাসল ফিল মিলাল ওয়ান নিহাল□ সহ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

পরবর্তী সময়ের আরেকজন বিখ্যাত আলেম ইমাম শাওক্বানী তাঁর □ইরশাদ আল ফুহুল□, □আস সাইল আল জাররার□ এবং তাঁর

রিসালা আল কাওল আল মুফিদ ফিল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলীদ সহ অনেক লেখনীতে এ মতের প্রচার ও প্রসার করেছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে তাকলীদের ধারণাকে প্রত্যাখান করেন যদিও তা ইবনে হাযমের তুলনায় কম আক্রামণাত্মক ছিল।

আমাদের সময়ে আহলে হাদীসদের থেকে একটি দল এ মতের সমর্থক যাদের সম্মুখভাগে রয়েছেন শাইখ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী ও তাঁর অনুসারীগণ।

এই মতানুসারীদের প্রতিপক্ষগণ তাঁদের নাম দিয়েছেন আল লা-মাযহাবিয়্যুন তথা লা-মাযহাবী, কেননা এ মতের অনুসারীগণ আলেম-সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সবার জন্য কোন মাযহাব অনুসরণের বিরোধিতা করে থাকেন। এ মতের প্রতিপক্ষগণ বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থের মাধ্যমে এই মতের খন্ডন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তুরস্কের বিখ্যাত আলেম মুহাম্মাদ যাহিদ আল কাওছারীর প্রবন্ধ আল লা মাযহাবিয়া কেনতারা ইল্লা আল-লা দ্বীনিয়্যাহ, হামাওয়ী আলেম শাইখ মুহাম্মাদ আল হামিদের লেখা ও শাইখ মুহাম্মাদ সাঈদ রামাদান আল বুতীর বই আল লা মাযহাবিয়াহ আখতার বিদাআহ তাহাদ্দাছ আশ-শারীয়াহ আল ইসলামিয়্যাহ প্রভৃতির কথা বলা যেতে পারে।

এই আরেকটি প্রান্তিক মতের খুঁটিনাটি ও সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতাগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

১। সবার জন্য তাকলীদ নিষিদ্ধ এমনকি সাধারণ মানুষের জন্যও যাদের কাছে ইজতিহাদের কোন জ্ঞান নেই।

২। তরুণদের এমন প্রাচুর্য (যারা জ্ঞানে ভাসা ভাসা এবং আচরণে রুক্ষ) যারা মুজতাহিদের পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার দাবী করে থাকে।

৩। তরুণদের দ্বারা পূর্বযুগের বিখ্যাত আলেম ও মুজতাহিদগণকে বাতিল বলে গণ্য করার ধৃষ্টতা।

৪। উম্মাহর ফিকহী মাযহাবগুলোর প্রতি অবজ্ঞাভাব যদিও এই মাযহাবগুলো প্রচুর পরিমাণ উপকারী জ্ঞানের উৎস।

৫। এ মতের কিছু কিছু অনুসারীদের মাযহাবসমূহ এবং এগুলোর ইমামদের নিন্দায় সীমা অতিক্রম করা।

৬। এ মতের অনুসারীদের মধ্যে যাহেরী (আক্ষরিক) ধারা এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে কেউ কেউ তাদের নব্য-যাহেরী হিসেবেও নামকরণ করেছেন।

৭। ফিকহের ছোটখাটো মতপার্থক্য নিয়ে উম্মাহর তর্কে-বিতর্কে লিপ্ত থাকা যা অনেক অন্তর্বিরোধের জন্ম দিয়েছে।

৮। এ মতের অনুসারীগণ তাদের সাথে মতভিন্নতা পোষণকারীদের বাতিল হিসেবে গণ্য করে। তারা এ দাবী করে যে, একমাত্র তারাই কোরআন ও সুন্নাহর যথার্থ অনুসরণ করে থাকে।

ইমাম আশ-শাওকানী এবং তাকলীদঃ

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ শাওকানী (মৃত্যু ১২৫০ হিজরী) ছিলেন হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পুনর্জাগরণ এবং ইজতিহাদের প্রাণপুরুষ যা তাঁর ইজতিহাদের উপর লেখা গ্রন্থসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয়। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর আস সাইল আল জাররার গ্রন্থটির কথা বলা যেতে পারে যা আল আযহার (যায়েদী বা হাদুয়ী ফিকহের মৌলিক বই) বইয়ের ব্যাখ্যা যেখানে তিনি স্বাধীন ইজতিহাদের পথে হেঁটেছেন। তিনি কোরআন ও সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে নিজের ফিকহী রায় ব্যক্ত করেন যেগুলো তাঁর সময়কার চার অথবা আট মাযহাবের পরিধির বাইরে ছিল। আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে তাঁর নাইলুল আওতার গ্রন্থটি যেখানে তিনি ইবনে তাইমিয়াহর মুনতাকাল আখবার মিন আহাদীস সায়্যিদ আল আখবার গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেছেন। এ বইটি সুন্নী এবং অসুন্নী উভয় মাযহাবের জন্য আধুনিক ফিকহের উপর গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্পদে পরিণত হয়েছে। আরেকটি উদাহারণ হচ্ছে তাঁর গ্রন্থ আল দারারী আল মুদিয়্যাহ (আল দুরার আল বাহিয়্যাহ গ্রন্থের ব্যাখ্যা) যেখানে তিনি তাঁর স্বাধীন ফিকহের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন।

প্রকৃতপক্ষে ইমাম শাওকানী তাঁর একের বেশী গ্রন্থে তাকলীদের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং স্বাধীন ইজতিহাদের দিকে আহবান করেন। এগুলো হচ্ছেঃ

১। ফিকহের উসূলী মূলনীতির উপর তাঁর বিখ্যাত বই ইরশাদ আল ফুহুল

২। তাঁর বিখ্যাত রিসালাহ “আল ক্বাওল আল মুফিদ ফি আদিল্লাতিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্বলীদ”

৩। তাঁর বই “আদাব আল তালিব ওয়া মুনতাহা’ল আরাব”

৪। তাঁর সুবিস্তারিত বই “আল সাইল আল জাররার”

তাক্বলীদের সমর্থকগণ তাক্বলীদের সমর্থনে যেসব দলিল পেশ করেন আশ শাওক্বানী এর ভিন্ন ব্যাখ্যা দান করেন যেসব দলিলের মধ্যে রয়েছে কোরআনের আয়াতঃ “তোমরা যদি না জেনে থাকো তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর।” (১৬:৪৩) আর রাসূলের (সাঃ) হাদীছঃ “তারা যদি না জেনে থাকে তবে কি তারা জিজ্ঞাসা করে না? ভ্রান্তির প্রতিষেধক হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা”। আশ শাওক্বানী এটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন যে, এসব দলিল সব বিষয়ে কেবল একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির তাক্বলীদ করার কথা বলে না বরং জ্ঞানীদের মধ্যে যার কাছেই যাওয়ার সুযোগ আছে তাকেই জিজ্ঞাসা করার দিকে ইঙ্গিত করে। এটাই নবী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের সময়ের চর্চা ছিল।

আশ-শাওক্বানী ইবনিল কায়্যিম, ইমাম ইবনি আবদিল বার, ইবনে হাযম এবং তাঁর আগের অন্যান্য আলেমদের লেখা থেকে উপকৃত হন যারা তাক্বলীদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে এ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং একে নিন্দনীয় বিদা’আত হিসেবে গণ্য করেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন, আল্লাহর নেয়ামত সুবিস্তৃত এবং এ নেয়ামতকে কোন নির্দিষ্ট যুগের মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না বা নির্দিষ্ট এক দল মানুষও এর একচেটিয়া অধিকারী নয়। বরং আল্লাহ যাদেরকেই এ যোগ্যতা দান করেছেন তাদের সবার জন্য এটি উন্মুক্ত।

আশ-শাওক্বানী ইজতিহাদের ডাক দেন এবং নিজেও পুরোপুরিভাবে স্বাধীন ইজতিহাদের চর্চা করেন। তিনি সুপরিচিত কোন মাযহাবেরই অনুসরণ করেন নি – না ফিক্বহের উসূলী মূলনীতিতে না মূল ফিক্বহে – যদিও তিনি শুরুতে ছিলেন একজন যায়েদী। তিনি এমনকি তাঁর নিজের ফিক্বহী মূলনীতি প্রণয়ন করেন যা তিনি “ইরশাদ আল ফুহুল ইলা তাহক্বীক আল হাক্ব মিন আল ইলমি আল উসূল” গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেন।

তিনি ফিক্বহের ক্ষেত্রে স্বাধীন আইনী যুক্তিতর্ক (legal reasoning) এবং মতের (রায়) ব্যবহারের বিরোধিতা করেন এবং আহলুর রায় এর ফিক্বাহকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। এর পরিবর্তে তিনি পরিপূর্ণভাবে ওহীর উপর নির্ভরতার ব্যাপারে জোর দেন এই ভিত্তিতে যে দ্বীন ইমামদের মতের ভিত্তিতে নির্মিত হয়নি বরং এটি দ্বীনের মোহর (Seal of the Religion) আল্লাহর রাসূল (সা) এর বর্ণনার ভিত্তিতেই গঠিত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে একজন সাধারণ মানুষ যে ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখে না তাকে অবশ্যই আলেমদের শরণাপন্ন হতে হবে যারা কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে নিজেদের অবস্থান ব্যক্ত করবেন, নিজেদের মতের ভিত্তিতে নয়।

আমি শাওক্বানীর সাথে কিছু ব্যাপারে একমত আর কিছু ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করি। যে সব বিষয়ে আমি তাঁর সাথে একমত পোষণ করি সেগুলো হচ্ছেঃ

১। আলেমদের প্রতি তাঁর স্বাধীন ইজতিহাদের আহবান

২। উম্মাহর সকলের উপর যারা তাক্বলীদ চাপিয়ে দিতে চান তাদের প্রত্যাখ্যান করা

৩। যারা প্রত্যেকটি বিষয়েই যেকোন একটি মাযহাবের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকাকে প্রয়োজনীয় মনে করে তাদের বিরোধিতা করা

৪। তাদের বিরোধিতা করা যারা কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট মাযহাবকে কঠোরভাবে অনুসরণ করেন এমনকি সে মাযহাবের কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে ঐ মাযহাবের উৎসসমূহের দুর্বলতা তাদের সামনে পরিস্কারভাবে তুলে ধরার পরেও

৫। দ্বিতীয় বা তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর পর ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে এমন ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করা

৬। মানুষের মতের উপর কোরআন ও সুন্নাহকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য উম্মাহ্‌র প্রতি তাঁর আহবান

যাহোক, সাধারণ মানুষের উপর তাক্বলীদ ও যেকোন একটি মাযহাব অনুসরণ করার উপর তাঁর নিষেধাজ্ঞা

আরোপের ব্যাপারে আমার দ্বিমত রয়েছে। সাধারণ মানুষের আবু হানিফা, মালিক, শাফিঈ, আহমেদ, যাইদ, আল হাদি, জাফর, জাবির এবং অন্যান্য যেকোন একজন ইমামকে অনুসরণ করা ও তাঁর মাযহাব আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে আমি কোন সমস্যা দেখি না। শরীয়াহ অনুসারে তা বৈধ কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়। সাধারণ মানুষের কোন মাযহাব নেই- এ মতটিই অগ্রাধিকার পায়। বরং আলেমদের মধ্য থেকে যার কাছ থেকে সে জিজ্ঞাসা করছে সে আলেমের মাযহাবই তার মাযহাব। এভাবে সে তার মাযহাব থেকে অন্য মাযহাবে যেতে পারে এবং আলেমদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা তাকেই যেকোন প্রয়োজনীয় বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারে। এমনকি সে ক্ষেত্রবিশেষে নিজের মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাবও অনুসরণ করতে পারে যদি সে বিশ্বাস করে অন্য মাযহাবের আরো শক্ত দলিল রয়েছে।

ফিক্বহে স্বাধীন আইনী যুক্তিতর্ক (legal reasoning) এবং মত (রায়) ব্যবহারকে শারীয়াহ বিরোধী প্রতিপন্ন করে ইমাম শাওক্বানী যে অবস্থান নিয়েছেন সে ব্যাপারেও আমার দ্বিমত রয়েছে। প্রকৃত বাস্তবতা এটাই যে, মত বা রায় ছাড়া কোন ফিক্বহ নেই। নিন্দনীয় রায় হচ্ছে সেটিই যা সুস্পষ্টভাবে নুসুসের (কোরআন ও সুন্নাহ) বিরুদ্ধে যায়। কিন্তু যে সকল বিষয়ে নুসুসের কোন বক্তব্য নেই সে সকল বিষয় বুঝতে এবং নুসুসকে এর বুনিয়াদী ভিত্তি ও মাক্বাসিদ আশ-শারীয়াহর আলোকে অনুধাবন করতে রায় অপরিহার্য। এছাড়াও রায় আবশ্যক যেখানে আইনী প্রশস্ততা বিদ্যমান থাকার দরুণ কিছু নির্দিষ্ট বিষয় এড়িয়ে যাওয়া যায় অথবা যেসব বিষয়ে অবশ্য পালনীয় এমন পরিষ্কার নির্দেশনামূলক (কাতঈ) আয়াত ও হাদীস বিদ্যমান নেই। আর এই রায় গঠিত হয় নিম্নরূপেঃ

১। কোরআন-সুন্নাহর ভিত্তি করে ক্বিয়াসের (সাদৃশ্যতার উপর ভিত্তি করে যুক্তিতর্কের একটি পদ্ধতি) মাধ্যমে অথবা

২। ইসতিহসানের (আইনী অগ্রাধিকার) মাধ্যমে যা হচ্ছে একটি শক্তিশালী কিন্তু অস্পষ্ট ক্বিয়াসের জন্য দুর্বল কিন্তু স্পষ্ট ক্বিয়াসকে এড়িয়ে যাওয়া অথবা

৩। ইসতিসলাহের (বৃহত্তর কল্যাণের খোঁজ করা) মাধ্যমে যা হচ্ছে আইনী শর্তসমূহ মাথায় রেখে সার্বজনীন কল্যাণের জন্য কাজ করা বা

৪। উরফের (প্রচলিত প্রথা) মাধ্যমে, একে নিজের স্থানে রেখে অথবা

৫। সাদ আল-জারাঈ (খারাপের দিকে ধাবিত করে এমন পথ রুদ্ধ করা) অথবা

৬। ইসতিসহাবের মাধ্যমে (ধারাবাহিকতার অনুমতি) ইত্যাদি।

এ সবগুলোর প্রয়োগে রায়ের ব্যবহার জড়িত। ফক্বীহগণ কি আসলেই এটি ব্যবহারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন? একইভাবে উমর, উসমান, আলী, ইবনে মাসউদ, যায়েদ, ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্যদের ফিক্বহ কি রায় থেকে মুক্ত?

এমনকি রায় ছাড়া কি কোরআন-সুন্নাহ সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব? রাসূল (সাঃ) এর সাহাবীরা বনু কুরাইজার পথে আসরের সালাত আদায় করার সময় কি রায়ের ব্যবহার করেন নি? ইবনে তাইমিয়্যাহ এর মতে, তারা তাদের চাইতে বেশী সঠিক ছিলেন যারা সালাতের সময় অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পর গন্তব্যে পৌঁছে সালাত আদায় করেছিলেন।

মাক্বাসিদ আস শারীয়াহ কি কোরআন-সুন্নাহ বোঝার ক্ষেত্রে রায় ব্যবহারের উদাহারণ নয়?

দুর্ভিক্ষের সময় উমর (রাঃ) কর্তৃক চুরির হদ্দের সাময়িক রহিতকরণ কি রায়ের উদাহরণ নয়? রক্তপণের দায়িত্ব গোত্র থেকে রাষ্ট্রের উপর স্থানান্তরের তাঁর যে সিদ্ধান্ত তা কি রায়ের উদাহরণ নয়? ইরাকের কিছু বিজিত এলাকা মুসলিম সেনাবাহিনীর মধ্যে বন্টন করার বিরুদ্ধে উমরের সিদ্ধান্ত কি রায়ের নমুনা নয়? মুসলিম নারীদের উপর প্রভাবের ভয়ে তাঁর কর্তৃক আহলে কিতাবের নারীদের বিয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা কি রায় ছিল না? বিপরীতমুখী সিদ্ধান্ত দেয়ার পরও উত্তরাধিকার আইনে আপন ভাইদের সাথে মায়ের দিক থেকে সৎ ভাইদের অন্তর্ভুক্তিকরণ কি রায়ের একটি নমুনা ছিল না?২

স্বামীর মৃতপ্রায় মুমূর্ষ অবস্থায় দেয়া তালাক কার্যকর হয় না- উছমান (রাঃ) এর এই মত কি রায়ের উদাহারণ ছিল না?৩ এ বর্ণনা কি পাওয়া যায় না যে, আবু বকর ও অন্যান্য সাহাবীরা বলতেন, আমি আমার রায় দ্বারা ফতোয়া দেই। যদি তা সঠিক হয় তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যদি তা ভুল হয় তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সকল ত্রুটির উর্ধ্বে।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কি মুয়াযকে (রাঃ) ইয়েমেনে পাঠানোর সময় তাঁর জবাব গ্রহণ করেন নি? তিনি (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি কি দ্বারা বিচারকর্ম সম্পাদন করবে?” মুয়ায (রাঃ) জবাব দিলেন যে, তিনি আল্লাহর কিতাব দ্বারা বিচার করবেন, অতপর রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ দ্বারা বিচার করবেন। যদি আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহতে সমাধান পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে তিনি বলেন, “আমি আমার রায় দ্বারা ইজতিহাদ করবো।”

সাহাবারা কি নিজেদের রায় এবং বোঝাপড়ার ভিন্নতার কারণে কিছু কিছু বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন নি?

তৃতীয় মতঃ যারা ইজতিহাদ করার যোগ্যতায় পৌঁছেনি তাদের জন্য তাক্বলীদের অনুমতি দেয়া

এই মতটি এর অনুসারীদের উপর প্রথম মতের মত তাক্বলীদ চাপিয়ে দেয় না আবার দ্বিতীয় মতের মত একে নিষিদ্ধও গণ্য করে না। বরং, এটি কারো কারো জন্য তাক্বলীদের অনুমতি দেয় এবং অন্যদের জন্য তা নিষিদ্ধ করে। ইমাম হাসান আল বান্না এ বিষয়টি তাঁর “বিশটি মূলনীতি” প্রবন্ধের একটি মূলনীতির আলোচনায় আলোকপাত করেছেনঃ

“ফিক্বহ ও ফিক্বহী রায় আহরণ করার পেছনের যুক্তি বোঝার যোগ্যতা অর্জন করে নি এমন প্রত্যেক মুসলিমের উচিত ইসলামী ফিক্বহের মহান ইমামদের অনুসরণ করা। একজন ইমামকে অনুসরণ করার সময় তাঁর যুক্তিতর্ককে বোঝার চেষ্টা করা উচিত। একবার যখন সে ইমামের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তখন সে ইমামের যথার্থ যুক্তির ভিত্তিতে দেওয়া যেকোন পথনির্দেশ মেনে চলা উচিত। একইসাথে একজন মুসলিমের উচিত ফিক্বহ ও ফতোয়া আহরণের যুক্তিতর্ক বোঝার পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য দরকারী চেষ্টাসাধনা করা।”

এভাবে হাসান আল বান্না তাক্বলীদ বা মাযহাবের অনুসরণকে বাধ্যতামূলক করেন নি আবার একে নিষিদ্ধও করেন নি। বরঞ্চ তিনি এর অনুমতি দিয়েছেন কিন্তু তা সবার জন্য নয়। এটি বৈধ “এমন সব মুসলিমদের জন্য যারা ফিক্বহী রায় আহরণ করার পর্যায়ে পৌঁছে নি” তথা সাধারণ মানুষ এবং তাদের মত লোকদের জন্য যারা কোরআন ও সুন্নাহ থেকে হুকুম আহরণের যোগ্য নয় অথবা ইজমা, ক্বিয়াস এবং মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য পদ্ধতি যেমন ইসতিসলাহ, উরফ, ইসতিসহাব ও পূর্ববর্তী সময়ের শরীয়াহ এসব সম্পর্কে জানার যোগ্যতা রাখে না।

অনুসরণ (ইত্তেবা) বনাম অন্ধ অনুকরণ (তাক্বলীদ)

উস্তায হাসান আল বান্না প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে তাঁর “মূলনীতি” প্রবন্ধে “তাক্বলীদ” শব্দটির জায়গায় “ইত্তিবা” শব্দটির প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, “মুসলিমরা ফিক্বহের মহান ইমামদের যেকোন একজনকে অনুসরণ (ইয়াত্তাবি’উ) করবে।” কোরআনও নানা প্রসঙ্গে “ইত্তিবা” শব্দটি ব্যবহার করেছে যা একে প্রশংসনীয় ও আইনগতভাবে বৈধ করে তুলেছে।

এটি ইব্রাহীম (আঃ) এর উদ্ধৃতিতেও দেখা যায়ঃ “হে আমার পিতা, নিশ্চয়ই আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসে নি। অতএব আমাকে অনুসরণ করুন। আমি আপনাকে সোজাপথের দিকে ধাবিত করবো।” (কোরআন ১৯:৪৩)। এই আয়াত কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে জ্ঞানহীন একজনকে আহবান করছে অন্য এমন একজনকে অনুসরণ করতে যে ঐ বিষয়ে জ্ঞানী।

আমরা মূসা (আঃ) এবং আল্লাহর বিখ্যাত সৎকর্মশীল বান্দা খিযির এর কাহিনীতেও দেখিঃ “তাঁরা আমার বান্দাদের মধ্য থেকে একজনকে খুঁজে পেল যাঁকে আমি নিজের অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলাম। মূসা তাঁকে বলল, “আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি যাতে আপনাকে হিদায়াতের যা কিছু শেখানো হয়েছে তা থেকে আমাকেও কিছু শেখাবেন?” (কোরআন ১৮:৬৫-৬৬)

মূসা (আঃ) খিযিরকে অনুসরণ করার (ইত্তিবা’ইহি) অনুমতি চাইলেন যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে যে জ্ঞান দিয়েছেন তা থেকে শিখতে পারেন। এটা প্রমাণ করে, ক্ষেত্র বিশেষে জ্ঞানীকে অনুসরণ করা নিন্দনীয় নয়।

ইমাম আবু উমার ইবনে আবদুল বার বলেন, “জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিষ্কার ধারণা অর্জন; কোন জিনিসকে এর প্রকৃতরূপে অনুধাবন করা। যখন কোন জিনিসকে কারো সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়, সে তা জানতে পারে। আলেমরা বলেন, যারা তাক্বলীদ করে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।”

আবু আবদুল্লাহ বিন খুয়াইজ মিনদাদ আল বাসরী আল মালিকী বলেন, “তাক্বলীদ হচ্ছে এমন কোন মতকে অনুসরণ করা যা কোন

দলিল দ্বারা সমর্থিত নয়। কিন্তু ইত্তিবা শব্দটি ইঙ্গিত করে যে এই মতটি আইনী ন্যায্যতার ভিত্তিতে গৃহীত। দ্বীনে ইত্তিবা অনুমোদিত কিন্তু তাক্বলীদ অনুমোদিত নয়।

তথ্যসূত্রঃ

১। প্রবন্ধটি মূলত কাইফা নাতাআমাল মাআত তুরাছ ওয়াল তামাযুব ওয়াল ইখতিলাফ গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে (পৃষ্ঠা ৬২-৭৩)

২। এটি ইসলামী উত্তরাধিকারী আইনের একটি বিশেষ পরিস্থিতি (আল মাসলাহা আল হিমারিয়াহ)

৩। এটিকে তালাক্ব আল ফার্ (এড়ানোর জন্য তালাক্ব) বলে যেখানে কেউ স্বীয় উত্তরাধিকার থেকে তার স্ত্রীর অংশ লাভের সম্ভাবনাকে এড়িয়ে যেতে চায়

সূত্রঃ VirtualMosque.com

ইউসুফ আল ক্বারাদাওয়ী

প্রফেসর ড. ইউসুফ আল ক্বারাদাওয়ী একজন ইসলামী চিন্তাবিদ, পন্ডিত ও কুশলী। ইসলামী জ্ঞানে তাঁর গভীরতা এবং সমসাময়িক বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদের কি ভূমিকা হবে সে বিষয়ে সুচিন্তিত মতামতের জন্য তিনি সারা বিশ্বে সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র। ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংলাপের উপর তিনি সব সময় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।
বিখ্যাত মিশরীয় পণ্ডিত ড. ক্বারাদাওয়ীর জন্ম ১৯২৬ সালে। দশ বছর বয়সেই তিনি সম্পূর্ণ কুরআন হেফজ করেন এবং কুরআন তেলাওয়াতের নীতিমালা, তাজবীদের উপর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তিনি আল আজহারেই পড়ালেখা করেন। ১৯৭৩ সালে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উসূল আল দ্বীন অনুষদ হতে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ড. ক্বারাদাওয়ী আল আজহার ইনস্টিটিউটে মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশুনার সময়ই তার প্রতিভার স্বাক্ষর হিসেবে শিক্ষকদের কাছ থেকে আল্লামা বা মহান পণ্ডিত খেতাবে ভূষিত হন। ১৯৫৮ সালে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর ডিপ্লোমা করেন। এর আগে তিনি আরবী ভাষা অনুষদ থেকে শিক্ষকতার সনদ পান।
ড. ক্বারাদাওয়ী মিশর সরকারের আওকাফ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বোর্ড অব রিলিজিয়াস এফেয়ার্স-এর একজন সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি আলজেরীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ইসলামিক সায়েন্টিফিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। বর্তমানে তিনি জেদ্দাস্থ ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) ফিকাহ একাডেমী, মক্কাভিত্তিক রাবেতা আল আলম আল ইসলামীর ফিকাহ একাডেমী, রয়াল একাডেমী ফর ইসলামিক কালচার এন্ড রিসার্চ জর্ডান, ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টার অক্সফোর্ড-এর সদস্য, ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর ফতোয়া এন্ড রিসার্চ-এর প্রেসিডেন্ট এবং কাতার সীরাহ স্টাডিজ সেন্টারের পরিচালক। তিনি বাংলাদেশস্থ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম এর ট্রাস্টি বোর্ডেরও সদস্য।
তাঁর এ পর্যন্ত ৪২টিরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজি, তুর্কী, ফার্সী, উর্দু, ইন্দোনেশিয়া সহ বিশ্বের অন্যান্য অনেক ভাষায় তার বই অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত এ বইটি সহ মোট ৮টি বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, ইসলামের যাকাত বিধান, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন বই তিনটি খায়রুন প্রকাশনী প্রকাশ করেছে। এছাড়া নতুন সফর প্রকাশনী, ঢাকা আধুনিক যুগ, ইসলাম, কৌশল ও কর্মসূচি এবং সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্যা কুরআন এন্ড সুন্নাহ, চট্টগ্রাম দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম প্রকাশ করেছে। ড. ক্বারাদাওয়ীর ইংরেজি ভাষায় অনূদিত www.qardawi.net/english বই ওয়েব সাইটে পাওয়া যায়।
তিনি একজন স্বনামধন্য কবি। নিজস্ব কাব্য বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি আরব বিশ্বে সুপরিচিত। বর্তমানে ড. ক্বারাদাওয়ী আল জাজিরাহ টেলিভিশনে একটি সরাসরি সম্প্রচারিত সাপ্তাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করছেন। বিশ্বের কোটি কোটি দর্শক শ্রোতা এ অনুষ্ঠান উপভোগ করে থাকেন।
বাল্যকাল থেকেই তিনি ইসলামের একজন সক্রিয় কর্মী। এর জন্য তাঁকে ১৯৪৯, ১৯৫৪-১৯৫৬ এবং ১৯৬৫ সালে কারাবরণ করতে হয়। আরব ও মুসলিম দেশ সমূহের প্রতি পাশ্চাত্য বিশ্বের বিশেষ করে আমেরিকা ও বৃটেনের পররাষ্ট্র নীতির জন্য তিনি তাদের একজন কঠোর সমালোচক। একই সাথে ফিলিস্তিন প্রশ্নে ইসরাঈলের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধ, একপেশে ও নিঃশর্ত সমর্থনের তিনি তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করেন। ইরাকে ইঙ্গো-মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে তার সাম্প্রতিক বক্তব্য বিশ্বব্যাপী মুসলিম জনগণের মতামতকে শাণিত করতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। তিনি একজন মানবাধিকারের প্রবক্তা। নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের সপক্ষে তিনি সোচ্চার যা তার বিভিন্ন লেখনীতে প্রতিফলিত হয়েছে।
ড. ক্বারাদাওয়ী পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য, আরব ও মুসলিম দেশসমূহ ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছেন। তিনি বাংলাদেশেও বেশ কয়েকবার এসেছেন।